তারিখ ... 09 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

শিক্ষার উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হলো পাঠকক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তোলা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নানাবিধ সমস্যায় ওই লক্ষ্য বিফলে যাচ্ছে। আর সম্ভবত এ কারণেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন হয়ে উঠেছে কোচিং ও প্রাইভেটনির্ভর। মূলত শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের সংকটের কারণেই শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, পরীক্ষাগুলোয় শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্য হওয়া এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব সৃষ্টির মতো ঘটনা আমাদের চোখে পড়ছে। শিক্ষার এসব সংকট মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সংকল্প ও সদিচ্ছা, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং জাতির শিক্ষা চিন্তায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যথেষ্ট ন্যায্যতা রয়েছে

ড. সুলতান মাহমুদ রানা ▷

বাধ্যতামূলক শিক্ষার চেতনা কি হারিয়ে যাচ্ছে?

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক সংকট। আর এ নিয়ে আলোচনারও শেষ নেই। বিদ্যমান সংকট ও সমস্যাগুলোর কোনোটি আমাদের চোখে পড়ে আবার কোনোটি চোখে পড়লেও এড়িয়ে যাই। তবে বেশির ভাগ সমস্যাই উপলব্ধিযোগ্য। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারি না অথবা চাই না। বিশেষ করে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। ফলে এগুলো আর সমস্যা মনে হয় না। শিক্ষার যত স্তর রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ স্তর প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু এ স্তরের শিক্ষা কাঠামোতে রয়েছে নানা ধরনের অসামঞ্জস্যতা ও অন্যাযাতা। অথচ এই প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার হাতেখড়ি ঘটে। সে জন্য এর পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা যথাযথ হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। প্রায়ই গণমাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা নিয়ে নানাবিধ প্রতিবেদন চোখে পড়ে। এসব সমস্যার সমাধান নিয়েও নানা কথা চলে। কিন্তু বাস্তবে কোনো সমাধানই হচ্ছে না।

প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো নৈতিক, মানসিক, সামাজিক আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, প্রবণতা ও আগ্রহ অনুসারে তাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষালাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা। আর এসব লক্ষ্য সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষাকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়েছে। এ সূত্র মতে, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষই তার সন্তানকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য থাকে। সেটি সরকারি হোক আর বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করে থাকি, গ্রাম কিংবা শহর সব পরিবেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে না। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তের বাইরে থাকে নিম্নবিত্ত শ্রেণি। প্রকৃতপক্ষে নিম্নবিত্ত শ্রেণির সন্তানদের বেশির ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে থাকে। তবে কেন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান না, তার পেছনের কারণগুলো অনুসন্ধানযোগ্য।

আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় ও প্রধান সমস্যা হলো দীর্ঘ সময়সূচি। এমন সময়সূচি দেশের অভ্যন্তরে অন্য কোনো কিন্ডারগার্টেন কিংবা বেসরকারি পর্যায়ের কোনো বিদ্যালয়ে নেই বললেই চলে। তাহলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচি এত দীর্ঘ রাখার কারণ কী? সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী থাকা সত্ত্বেও কেন সমাজের সব স্তরের সন্তানরা ভর্তি হয় না কিংবা পড়তে আসে না, বিশেষ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হয় বিধায় চাকরির ন্যূনতম যোগ্যতা মেয়েদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পাস এবং পুরুষদের জন্য স্নাতক পাস থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষক হচ্ছেন। তাহলে প্রশ্ন এসে যায় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক থাকার পরও কেন অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মা-বাবা তাঁর সন্তানকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাচ্ছেন না? অন্যদিকে আমরা লক্ষ করি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সন্তানকে ভর্তি করানোর জন্য শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবক কিংবা মা-বাবারাও প্রতিযোগিতায় নেমে যান। তাহলে একই রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং একই শিক্ষা কাঠামোতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে সচ্ছল অভিভাবকদের অনীহা, অন্যদিকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে রীতিমতো প্রতিযোগিতা কেন?

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারের একটি বড় বাজেট আছে। তাহলে শিক্ষার্থীদের কেন টিফিনের ব্যবস্থা না করে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ধরে রাখা হয়? একটি দীর্ঘ সময়সূচি শিশু নির্যাতনের শামিল কি না এমন প্রশ্ন আগেও অনেক নিবন্ধে করেছি। এসব শিশু শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার জন্য দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ে অবস্থানের বিষয়টি সচেতন অভিভাবক পর্যায়ে এক ধরনের আতঙ্ক। অনেকের দৃষ্টিতেই এটি অত্যন্ত অমানবিক। কারণ আমরা জানি কারাগারে আসামিদেরও যথাযথভাবে খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। তাহলে এসব শিশু শিক্ষার্থীর জন্য কেন নয়? তা ছাড়া যেহেতু নিম্নবিত্ত ও অনগ্রসর অভিভাবকদের সন্তানরাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করে থাকে, সেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের যথাযথ খাবার নিশ্চিত করার প্রসঙ্গটি কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজরে থাকা উচিত। যদিও বাজেট স্বল্পতা ও শিক্ষার উন্নয়নের চিন্তাকে মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় কয়েকবার সমাজের উচ্চবিত্তদের তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষায় বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু আদৌ কি সে ধরনের বিনিয়োগে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব?

প্রাথমিক পর্যায়ের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হওয়ায় সরকার এর পেছনে অনেক অর্থ ব্যয় করে থাকে। তা সত্ত্বেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন টার্মের পরীক্ষার জন্য প্রতিবছর পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করা হয়। এটি অনেক ক্ষেত্রেই ওই শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের পথে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যেহেতু বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর অভিভাবকরাই অসচ্ছল, সেহেতু তাদের পক্ষে এ ব্যয় বহন করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। আর এ কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণতাও আমাদের চোখে পড়ে। যে রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করেছে, সেই চেতনার সঙ্গে কি এটি সাংঘর্ষিক নয়?

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে আরো কিছু সাংঘর্ষিক ক্ষেত্র রয়েছে। কারণ শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামর্থ্য, প্রবণতা ও আগ্রহ বিবেচনায় রাখতে হবে। অথচ বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত হওয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়েরই সামর্থ্য ও আগ্রহ কমে যায়। ফলে শিক্ষা আনন্দদায়ক এবং শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে অন্তরায় হয়।

শিক্ষার উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হলো পাঠকক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তোলা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নানাবিধ সমস্যায় ওই লক্ষ্য বিফলে যাচ্ছে। আর সম্ভবত এ কারণেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন হয়ে উঠেছে কোচিং ও প্রাইভেটনির্ভর। মূলত শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের সংকটের কারণেই শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, পরীক্ষাগুলোয় শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্য হওয়া এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব সৃষ্টির মতো ঘটনা আমাদের চোখে পড়ছে।

শিক্ষার এসব সংকট মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সংকল্প ও সদিচ্ছা, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং জাতির শিক্ষা চিন্তায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যথেষ্ট ন্যায্যতা রয়েছে। শিক্ষার মান উন্নত করতে, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে এবং পাঠদান ও গ্রহণ আনন্দময় করতে প্রাথমিক শিক্ষার যৌক্তিক সময়সূচি নির্ধারণ সাপেক্ষে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার চেতনাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিকল্প নেই।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
sultanmahmud.rana@gmail.com